পাঠক, আপনাকে ক-টা প্রশ্ন করি। আপনি যে-ই হোন, মহিলা, পুরুষ, তরুণ, মধ্যবয়সি, প্রৌঢ়।

১। কোনো মহিলা বাসের মধ্যে একজন পুরুষকে চড় মারল, সে পুরুষ নিজপক্ষ সমর্থন না করে অন্য পুরুষদের মধ্যে গিয়ে মহিলাকে নিয়ে যা-তা বলতে লাগল। আপনি কী করবেন?

● অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে থাকবেন? তা করলে সেটা ভয়ে, না বিরক্তিতে, না উদাসীনতায়?

● ব্যাপারটা কি আড়চোখে বুঝে নেবার চেষ্টা করবেন? তা করলে সেটা রসাল গল্পের আশায়, না ন্যায়-অন্যায় ঠাহর করার ইচ্ছেয়? দ্বিতীয়টি হলে বোঝার পর কিছু বলবেন? বললে কী বলবেন?

● আসলে কিছু বোঝার প্রয়োজন নেই এটা জেনে পুরুষদের টিটকিরিতে যোগ দেবেন? সেদিন, সেই বাসে, আপনিও কি ছিলেন? বা এরকম ঘটছে এমন কোনো বাসে?

● মহিলাদের সিটে বসে বা তার সামনে দাঁড়িয়ে কী হচ্ছে বেশ খানিকক্ষণ ধরে সেটা পরিষ্কার বুঝতে পেরে আপনি কী করবেন? কেন?

২। আমার বান্ধবী কি চড় মেরে বাড়াবাড়ি করল? আর আপনি, পুরুষ, নারী যে-ই হোন, আপনি কী করতেন? কেন?

৩। শান্ত, অন্যমনস্ক, মাঝবয়সি মহিলা হঠাৎ চড় মারল কেন বলুন তো?

আপনাদের মধ্যে নেহাতই অল্পবয়সি নন যাঁরা, এ ধরনের ঘটনার একটা অন্য পরিণতির সম্ভাবনার কথা তাঁদের মনে পড়তে পারে। বাসে-ট্রামে মেয়েদের শারীরিক অস্বস্তি ও অপমান যখন থেকে মেয়েরা ভিড়ের মধ্যে দিয়ে চলাফেরা করতে শুরু করেছেন তখন থেকেই আছে। কিন্তু একটা সময় ছিল যখন কোনো মেয়ের প্রতিবাদে আশেপাশের পুরুষযাত্রীরা সোচ্চার হয়ে উঠতেন—অসভ্য পুরুষটির প্রতি ধিক্কার এবং টিটকিরিতে। মহিলারা অস্বস্তিতে-পড়া বা অপমানিতা মেয়েটির পক্ষ নিয়ে কথা বলতেন।

কী বদলে গেল? কেন?

নারীর প্রতি হিংসা বেড়েছে, সংগঠিত হয়েছে, আর তার নির্লজ্জ প্রকাশে অনেকেই তলে তলে বেশ খুশি হচ্ছে, এটাই কি ধরে নিতে হবে? এর জন্যে নারীর স্বনির্ভর হবার চেষ্টা এবং সমানাধিকার অর্জনের চেষ্টাই কি দায়ী ? এটা কি অনেক কারণের মধ্যে একটা হতে পারে? সেক্ষেত্রে অন্য কারণগুলো কী?

অনেকেই বলবেন যে মেয়েরা সকলে যে বাসে-ট্রামে-ট্রেনে এই ধরনের ইচ্ছাকৃত

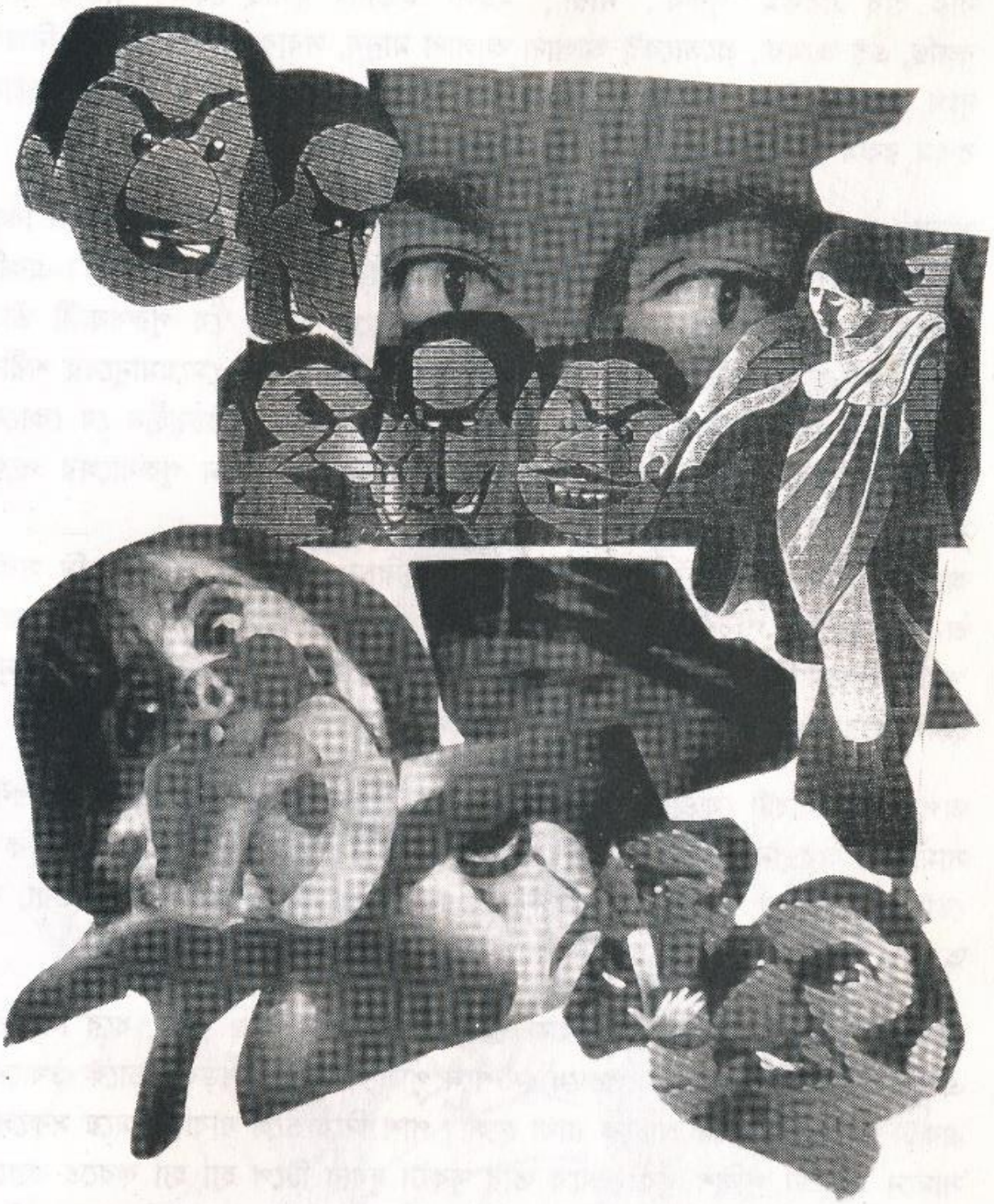

ঘষাঘষি অবাঞ্ছিত মনে করেন তা নয়; কেউ কেউ আরাম পান বোধহয়, বা নিজেকে কাঙ্ক্ষিত ভাবতে পেরে খুশিও হন। হয়তো দুটোই, এবং নিজেরাই অনেকসময়ে বাগে-প্রকারে একটু-আধটু আমন্ত্রণও জানিয়ে থাকেন। এটা তো হতেই পারে। কিন্তু যৌনতার জটিল মনস্তত্ত্ব এবং সমাজে তার বহিঃপ্রকাশের বিধিনিষেধ নিয়ে আমাদের আলোচনা নয়; আমাদের আলোচনা মেয়েদের ওপর হিংসাত্মক ব্যবহার নিয়ে, বিশেষত ঘরের বাইরে। এখানে তাই এটুকু মনে রাখলেই চলবে যে অনিচ্ছুক পুরুষকে দিয়ে সর্বসমক্ষে নারী কিছু করাতে পারে না, পুরুষ কিন্তু নারীকে যা ইচ্ছে তাই করতে পারে। মেয়েদের লজ্জা, ভয়, মজ্জাগত দোষীভাব, সবই পুরুষকে সাহায্য করে।

অসচ্ছল পরিবারে মেয়ে না চাওয়ার যেটা বড় যুক্তি বা একমাত্র যুক্তি বলে মেনে নেওয়া যেতে পারত, সম্পন্ন পরিবারে সে যুক্তিটা পুরোপুরি খাটে না। বিশেষ করে শিক্ষিত পরিবারে, যেখানে আজকাল মেয়েরা বেশির ভাগ সময়ে কাজ করে, রোজগার করে, কোনো অবস্থাতেই অন্যের বোঝা হয়ে দাঁড়ায় না। পণপ্রথা একটা প্রধান কারণ ধরে নিয়েও আমাদের দেখতে হবে অন্য সম্ভাব্য কারণগুলো কী। মেয়েদের রোজগারের কথা তুললে এটা ভাবতে হবে যে কন্যাকে উপার্জনক্ষম করে তোলার পর লগ্নিটা বিফলে গেল কি না। এখনকার সমাজব্যবস্থায় তা-ই কিন্তু হয়। শিক্ষার খরচ বেড়েছে, পণপ্রথাও রয়েছে, এ অবস্থায় বিবাহিতা নারী আয় করে সংসারের পুঁজি বাড়ালে বাপের বাড়ির লাভ না শ্বশুরবাড়ির? মেয়েদের সামলে রেখে উপযুক্ত করে তোলার বহুত ঝক্কি, তার ওপর তার শিক্ষার খরচ, বিয়ের খরচ—সে জায়গায় ছেলে হলে আখেরে লাভ শুধু নয়, অনেক দিক দিয়ে উপরিরও আশা রাখা যায়।

অথচ মেয়েরা রোজগার করতে শুরু করার পর থেকে সমাজে অল্প অল্প করে যে বদল হতে শুরু করেছে সেটা আমরা এখনো লক্ষ করছি না। ছোট পরিবারের কমসংখ্যক ছেলেমেয়েদের মধ্যে অনেকসময়েই দেখা যাচ্ছে মেয়েরা তাদের সাধ্যমতো যতটা বুড়ো বাবা-মাকে দেখে, ছেলেরা দেখে না। এটা একটা খুবই ছোট পরিসরে এখন দেখা যাচ্ছে, প্রধানত শহরের মধ্যবিত্ত কিছু পরিবারে, কিন্তু আবার এই শ্রেণীর মধ্যে মেয়েরা এখন পর্যন্ত নিজের পায়ে দাঁড়ানোর বেশি সুযোগ পেয়েছে। মেয়েদের দুয়ো করার আগে আমরা এটা দেখছি না কেন?

মেয়ের প্রতি মনোভাবটা পুরোটাই যুক্তি দিয়ে বোঝানো যাবে তা বোধহয় নয়। শিশুকন্যা হত্যার প্রচলন ছিল, আর ঘরে মেয়ে জন্মালে ঠাকুমারা দোরে খিল দিয়ে বৌকে অভিশাপ দিতে বসতেন, অথবা দুই নাতনির জন্মের পরে ছেলের আবার বিয়ে দিতেন, এসব তো পুরোনো গল্প। পুত্র না হলে তো পুন্নাম নামক নরক থেকে রেহাই নেই, বংশে বাতি দেবে কে? তার ওপর গ্রামেগঞ্জে মেয়ে বড় করার বিপদ অনেক, আর ছেলে হলে সংসারের লাভ হবে এটাও ঠিক। কিন্তু শহরকেন্দ্রিক সমাজে কী হচ্ছে? এই সমস্ত পুরোনো ভয়, নিরাপত্তাহীনতার বোধ কি এই দ্রুত পরিবর্তনময় সমাজে নতুন সাজে দেখা দিয়েছে? এই প্রশ্নটার উত্তর কিন্তু জরুরি। ভেবেচিন্তে দেখলে হয়তো বুঝব মেয়ে হওয়া সাংঘাতিক কোনো দুর্ঘটনা নয়। এটা একবার ভাবতে শুরু করলে পণপ্রথা দূর করার দিকেও খানিক এগোনো যাবে। 'ছেলে হলে রাখব আর মেয়ে হলে মারব'—এই মনোভাব নিয়ে যে কোনোমতেই আইনি ব্যবস্থার ফায়দা ওঠানো যায় না, সেটাও বোঝা যাবে।

অ্যাসিড ছোঁড়া

ব্যক্তিসম্পর্কজনিত হিংসা পথেঘাটে অনেকভাবে প্রকাশ পায়। দূর থেকে গায়ে মুখে অ্যাসিড ছুঁড়ে পুড়িয়ে দেওয়া এর একটা বীভৎস রূপ। বেশিরভাগ সময়ে দেখা গেছে যে এ ধরনের আক্রমণ করে ব্যর্থ প্রেমিক বা প্রেমিকদল। সবসময়ে যে এটা কোনো ভালোবাসার সম্পর্ক ভেঙে যাবার পর হয় তা-ও নয়। অনেক ক্ষেত্রেই এটা স্রেফ পাত্তা না দেবার শাস্তি, কিছু ক্ষেত্রে আলাপ বা বন্ধুত্বকে প্রেমের স্বীকৃতি না দেবার জন্যে শোধ তোলা।

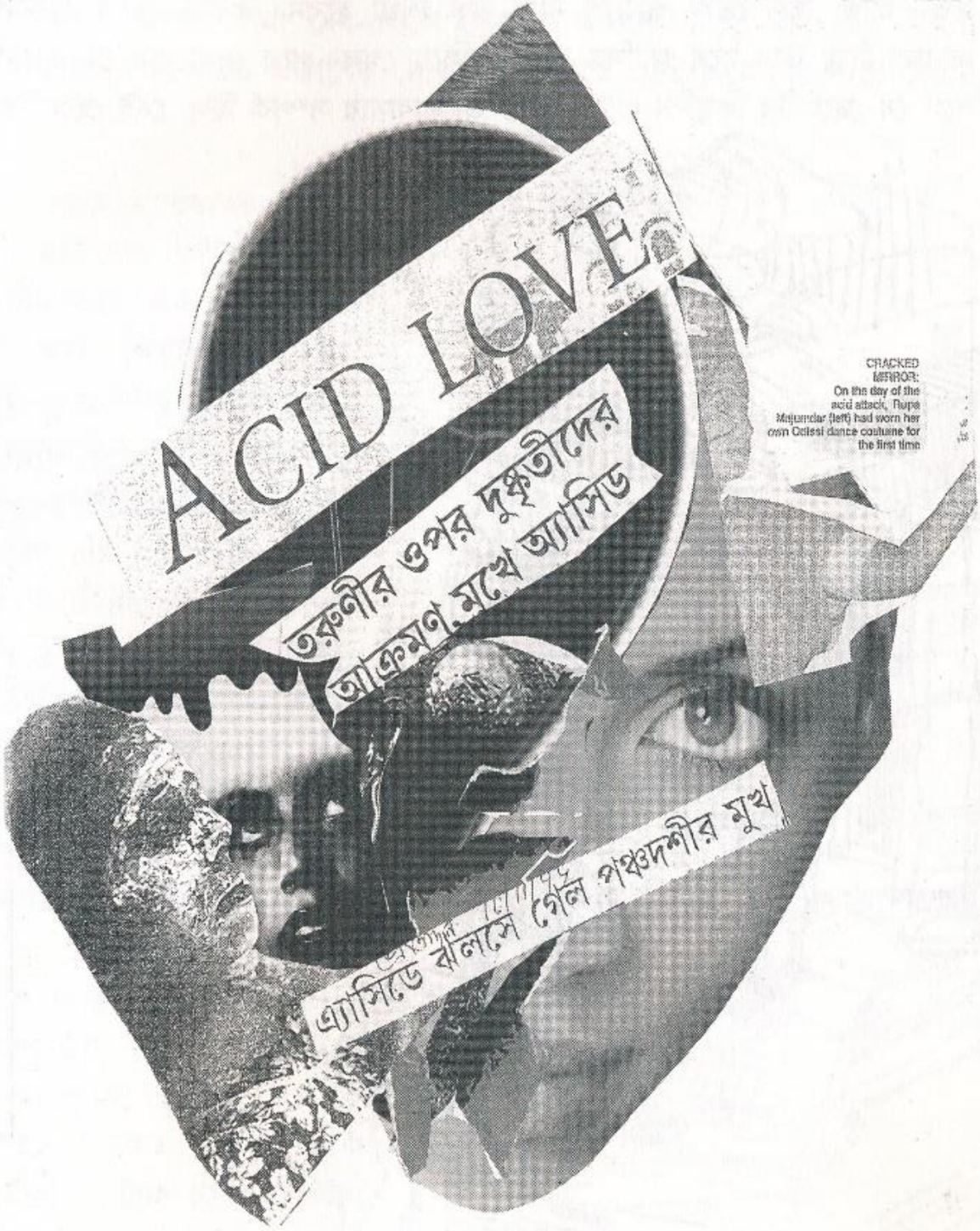

গণধর্ষণ

আশির দশকে ধর্ষণ আইনে কিছু পরিবর্তন নারী আন্দোলনের জয় সূচিত করলেও ক্রমশ দেখা গেল গণধর্ষণের ঘটনা যেন বাড়ছে। নব্বইয়ের দশকের শুরুতে পরপর কয়েকটি গণধর্ষণের ধাক্কায় এ রাজ্যের মেয়েরা স্তম্ভিত হয়ে যায়। গণধর্ষণের আলোচনায় ঢোকার আগে বলে রাখা দরকার যে শুধু ঘরের বাইরে নয়, চার দেওয়ালের মধ্যেও যদি একাধিক পুরুষ কোনো মেয়েকে ধর্ষণ করে তাহলেও সেটা সদর জগতের অপরাধ বলে ধরা উচিত।

তিনটে বহু আলোচিত ঘটনা দিয়ে নব্বইয়ের দশক শুরু। বানতলা এলাকায় ৩০শে মে, ১৯৯০ তিনজন পদস্থ স্বাস্থ্য অফিসারকে গাড়ি থেকে টেনে নামিয়ে যৌন নির্যাতন করা হয়। তাঁদের মধ্যে একজন মারা যান। ঠিক কী ঘটেছিল এটা খবরের কাগজের রিপোর্ট থেকে পুরো বোঝা যায় না, তবে গণধর্ষণ হয়েছিল, এটা মোটামুটি পরিষ্কার। গাড়ির ওপর সুপরিকল্পিত আক্রমণের ফলে ড্রাইভার পরে মারা যান। কাগজে পড়ে আমরা জানতে পারি যে অপরাধীরা স্থির নিশ্চিত ছিল

ওই মহিলারা বাচ্চাচোর। এই আজগুবি গল্পে খুব সহজেই রাজনীতি এনে জল ঘোলা করা যায়। কাগজগুলো তা-ই করেছিল। আর শিক্ষিত, কর্মরতা, পদমর্যাদাসম্পন্ন মহিলারা, যাঁরা এতদিন মনে করতেন কলকাতায় প্রকাশ্যে কেউ তাঁদের টেনে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করতে সাহস পাবে না, তাঁরা নতুন করে বিষয়টি নিয়ে ভাবতে শুরু করলেন।

বানতলা নিয়ে চেঁচামেচি চলাকালীন ৭ই জুন সিঙ্গুরে পুলিশ থানায় কাকলি সাঁতরা নামক একটি মেয়েকে বার বার ধর্ষণ করা হয়। এই ব্যাপারে পাঁচজন পুলিশকর্মীকে গ্রেপ্তারও করা হয়। এ বিষয়ে দুটি মন্তব্য প্রয়োজন। প্রথমত, এই গ্রেপ্তার খুব একটা অর্থবহ হয়ে ওঠেনি কারণ পুলিশি হেফাজতে ধর্ষণের ঘটনা বেড়ে চলছিল এবং পুলিশ সম্পর্কে মানুষের অনাস্থা তীব্র হচ্ছিল। দ্বিতীয়ত, পুলিশ আত্মরক্ষার অজুহাতে প্রথমে বলেছিল ধর্ষিতার মাথার ঠিক নেই, তারপরে বলল যে তার চরিত্র ভালো নয়। এ দুটো যাকে বলে ধ্রুপদি অজুহাত। যে মেয়েটি ধর্ষিতা হয়েছে তার কথা কোনোমতেই বিশ্বাস করা যায় না, এটা প্রমাণ করার জন্যে পাগল এবং দুশ্চরিত্র দুটোই বলা চলে। এর অনেকগুলো সুবিধে আছে। যে পাগল তার বাস্তব জগতের সঙ্গে সম্পর্ক প্রায় নেই, অতএব তার কথায় কান দেবার দরকার নেই। আর যে দুশ্চরিত্র সে তো মিথ্যে বলবেই। তার চরিত্রের দোষ কীভাবে প্রমাণ হয়? না, সে বহুগামিনী। ভদ্রসমাজ তার কথা শুনবে কেন? প্রথমত, সে জাত-মিথ্যেবাদী; দ্বিতীয়ত, সে নিশ্চয়ই লাভের আশায় পুলিশদের প্রলুব্ধ করেছিল। এক্ষেত্রে পুলিশের যুক্তি টেকেনি, কিন্তু অনেক সময়েই টিকে যায়। যে মেয়েটি যৌনহিংসার শিকার হয়েছে তার চরিত্র সন্দেহজনক প্রতিপন্ন করতে পারলে বিচারকে বিভ্রান্ত করা যায়। তার পক্ষে সুবিচার পাওয়া কঠিন হয় এবং অন্যদিকে অপরাধীর দণ্ড লঘু হয়ে যেতে পারে।

মেয়েদের প্রতি যৌনহিংসার ক্ষেত্রে অপরাধীদের দোষ ঢাকার জন্য সবসময় এই ধরনের যুক্তি ব্যবহৃত হয় কেন? হিংসার বাস্তবতা ভুলে গিয়ে গোড়াতেই এসব যুক্তিতে আমরা কান দিই কেন? আমরা আসলে বিশ্বাস করতে চাই মেয়েদের যৌনতাই অনিয়ন্ত্রিত, অতএব তারা বিশ্বাসযোগ্য নয়। মেয়েদের সম্ভ্রম তারা নিজেদের দোষে হারায় এবং পুরুষরা তো 'এসব' একটু করেই থাকে, এটাই 'স্বাভাবিক', তবে প্ররোচনা ছাড়া করেনি নিশ্চয়ই—এটা বিশ্বাস করতে পারলে আমরা নিশ্চিন্ত হই। গরিব, নিরক্ষর মেয়েদের ক্ষেত্রে উদোর পিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে চাপানো সবচেয়ে সহজ। আবার শিক্ষিত, স্বনির্ভর, মধ্যবিত্ত বা উচ্চবিত্ত মেয়েদের ক্ষেত্রেও যুক্তিগুলো একটু অন্যরকমভাবে সাজিয়ে লাগসই করে তোলা যায়। যে পুরুষের সর্বস্ব লুঠ হয়ে গেছে তার চরিত্র বা মানসিক স্থিতি নিয়ে আমরা মাথা ঘামাই কি? বরং সে আমাদের সহানুভূতির পাত্র হয়।